আফরিন

আলভী আহমেদ

ঢাকা : বাংলা মোটর | শাহবাগ | বাংলাবাজার
চট্টগ্রাম | রাজশাহী | সিলেট

সূচি

আফরিন	১১
ফেরা	৪২
তিওমান	৭৬
প্রফেসরস কলোনি	১০০
১২ মার্চ, ২০১৮	১২২
তেইশ বছর	১৩১
লোনার	১৪৬

আফরিন

পরপর কিছু দুর্ঘটনা ঘটল।

ইউনিভার্সিটি অব আরকানসা থেকে একটা ফান্ড পেয়েছিলাম। ক্রিয়েটিভ রাইটিংয়ে দুবছরের মাস্টার্স প্রোগামে আমেরিকায় যাওয়ার কথা, অগাস্টের শুরুতেই।

মার্চের ২৮ তারিখ ভার্সিটি থেকে একটা মেইল এল। ইনিয়েবিনিয়ে প্রচুর দুঃখ প্রকাশ করে চিঠিতে লেখা : যে ফান্ডটা পাওয়ার কথা ছিল, সেটা পাচ্ছি না।

২০২২-এর কথা বলছি।

এপ্রিলের মাঝামাঝি গিয়ে চাকরিটা হারালাম। চাকরি হারানো বলতে যা বোঝায়, ব্যাপারটা আসলে তা না। আমি কাজ করতাম একটা দৈনিকে, সিনিয়র সাব-এডিটর হিসেবে। মালিকপক্ষ জানাল তারা আর লোকসান দিতে পারবে না। পত্রিকাটা বন্ধ করে দিচ্ছে।

এর আগে অনেকবার ভেবেছি, ধুস শালা! চাকরিবাকরি করব না। এরকম ফালতু জীবন আর হয় না। প্রতিদিন আত্মার মধ্যে ময়লা জমে যাচ্ছে। চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে ময়লাগুলো ধুয়েমুছে সাফ করে ফেলব। কাউকে পুছতে হবে না, যখন খুশি ঘুম থেকে উঠব। সময়ের কোনো টানাটানি নেই, দুহাত ভরে গল্প-উপন্যাস লিখব। খাবদাব, ঘুরে বেড়াব, হ্যান করব, ত্যান করব। স্বাধীন জীবন হবে।

কিন্তু স্বাধীনতা ব্যাপারটা আসলে কী? মানুষ চাইলেই কি স্বাধীন হতে পারে? একটা খাঁচা থেকে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হলো। সাথে সাথে সে আরেকটা খাঁচায় বন্দি হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। আরও বড় কোনো খাঁচায়।

টাকাপয়সা জমানোর বদভ্যাস আমার কখনো ছিল না। দুমাসেই টের পেলাম, হাতে বেশ টান পড়েছে। তারপরও জুলাই মাসটা কোনো রকমে ধারকর্জ করে পার করে দিলাম। অগাস্ট নাগাদ রিয়েলাইজেশন হলো, এভাবে হবে না। শান্তিনগরের ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। আমার বয়স তখন ৩৩।

এই বয়সী লোকের পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক একটা কাজ করতে হলো। নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে বিছানা-বালিশ নিয়ে বড় চাচার বাসায় উঠে পড়লাম। একেবারে শূন্যে এসে দাঁড়ালাম। ঠিক ১৬ বছর আগে যখন জামালপুর থেকে প্রথম ঢাকায় আসি, তখনো জিগাতলার এ বাসাতেই উঠেছিলাম।

যা হোক, মনটাকে পেছনে টেনে লাভ নেই। আসল হলো ভবিষ্যৎ। অতীত তো কিছু না—ঘটে গেছে, বদলানো যাবে না। সামনের দিকে তাকাতে হবে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভাবলেই তখন আমার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসত। আশার কোনো আলো দেখতে পেতাম না।

***

আফরিনের সাথে পরিচয় সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি, এক ঝড়ের বিকেলে। সেটা কি আদৌ কোনো ঘটনা, নাকি চলমান দুর্ঘটনাগুলোর এক্সটেনশন, সেটা তর্কের বিষয়।

দিনটা ছিল শুক্রবার। বিছানা ছেড়েছিলাম অনেক দেরিতে। সকাল থেকে অবশ্য দফায় দফায় কয়েকবার ঘুম ভেঙেছে।

যতবার চোখ মেলেছি, জানালা দিয়ে দেখেছি বাইরে অন্ধকার। আকাশ গুম হয়ে আছে, যেকোনো সময় ঝেঁপে বৃষ্টি নামবে। এমন দিনে বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে হয় না। অভ্যাসবশেই বালিশের পাশে কয়েকবার হাত বাড়িয়েছিলাম। মার্লবোরোর প্যাকেটটা ওখানে থাকার কথা। দেড় বছর হলো সিগারেট ছেড়েছি, ভুলে যাই।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর কিছুক্ষণ আকাশের ভাও বোঝার চেষ্টা করলাম। বৃষ্টি নামলে বাইরে বের হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে বাতিল করে দেওয়া যেত। বাসায় বসেই মুভি-টুভি কিছু একটা দেখতাম। একটা ছোটগল্প মাথার মধ্যে গুছিয়ে রেখেছি। লেখাটা শুরু করা দরকার। বাংলা একাডেমি থেকে মুশকান ভাই নোয়াম চমস্কির একটা সাক্ষাৎকার অনুবাদ করে দিতে বলেছেন। ক্যাশ টাকার কাজ।

সব ফেলে সাড়ে তিনটার দিকে বাসা থেকে বের হলাম। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম ধানমন্ডি ২৭-এ। মিনাবাজারের পাশেই বেঙ্গল বই। আগের দিন সেখানে একটা ছোটগল্প সংকলন পড়তে শুরু করেছিলাম। রেমন্ড কারভারের লেখা, *হোয়াট উই টক অ্যাবাউট হোয়েন উই টক অ্যাবাউট লাভ*। তিনটা গল্প পড়েছি বইয়ের। সম্ভব হলে আজ এক বসায় বাকিটা শেষ করে ফেলব।

সন্ধ্যার দিকে সাখাওয়াত ভাই এখানে আসবেন বলেছিলেন। একটা ওয়েবজিন লঞ্চ করেছেন উনি। ফোনে চাকরির ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছি খানিকটা। মুখোমুখি হলে আলাপটা ঝালিয়ে নেওয়া যাবে।

বেঙ্গলের গেট দিয়ে ঢুকলেই কংক্রিটে বাঁধানো চত্বর। অনেকগুলো টেবিল-চেয়ার পাতা। খোলা আকাশের নিচে আড্ডার চমৎকার ব্যবস্থা। চত্বর পার হতেই নিচতলায় বইয়ের দোকান, বড় বড় তিনটা রুমে বইগুলো জনরা অনুসারে সাজানো।

খোলা উঠোনেও কয়েকটা বুকশেলফ আছে। সেখানেও

প্রচুর বই। এগুলো ঠিক বিক্রির জন্য নয়। ওপেন ফর অল, যার ইচ্ছা পড়বে। চা-শিঙ্গাড়া খেতে খেতে আরামসে এসব বই ঘাঁটা যায়।

ছুটির দিনে সাধারণত বেঙ্গলে বসার জায়গা পাওয়া যায় না। লোক গিজগিজ করে। কিন্তু সেদিন বৃষ্টির আশঙ্কা ছিল, তাই বোধ হয় কেউ বাসা থেকে বের হয়নি। দুয়েকটা বাদে সব টেবিলই ফাঁকা।

ক্যান্টিনটা চত্বরের একদম শেষ প্রান্তে। ছাদের নিচে। সেখান থেকে চা নিয়ে এসে বসলাম জামরুল গাছের ছায়ায়। রেমন্ড কারভারের বইটা ঠিক পাশের শেলফেই। খুঁজে পেতে সমস্যা হলো না।

দুপাতা পড়েছি মাত্র, টের পেলাম একটা বৃষ্টির ফোঁটা মুখে এসে পড়ল। তারপর পরপর কয়েকটা। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকতে শুরু করেছে। পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যায়—আগে ছিল ছাই রঙের, এখন একেবারে কালো। হঠাৎই একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেল। প্লাস্টিকের গ্লাসটা চাসহ উড়ে গেল একদিকে।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঝুপ করে বৃষ্টি নামল। পলিথিন হাতে দৌড়ে এল কয়েকজন, বইয়ের শেলফগুলো ঢেকে দিচ্ছে। প্রথমে কিছুক্ষণ পাত্তা দিলাম না। মনে হলো, বৃষ্টি যেমন এসেছিল তেমন হুট করেই চলে যাবে। প্রচণ্ড বাতাসে একটা ব্যানার যখন দড়িসহ ছিঁড়ে পড়ল গায়ের ওপর, বুঝতে পারলাম, আমার ধারণা ভুল। দৌড়ে ছাদের নিচে আশ্রয় নিলাম।

বাঁ দিকে একটা বুকশেলফ। সেখানে নিশ্বাস দূরত্বে দাঁড়ানো একটা মেয়ে। হাতে ইংরেজি পেপারব্যাক। বাইরে যে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি, সেদিকে খেয়াল নেই। ডুবে আছে বইয়ের পাতায়।

মেয়েটা এমন যে তার দিকে চোখ না পড়ে উপায় নেই। অফ

হোয়াইট জিন্সের সাথে পরেছে অলিভ গ্রিন ফতুয়া। চশমার ফ্রেমটা কোবাল্ট গ্রিন, ফতুয়ার সাথে ম্যাচ করে গেছে। বড় বড় দুটো চোখ। পুরো পৃথিবী যেন ছোট হতে হতে ওই চোখ দুটোর মধ্যে এঁটে গেছে। কোঁকড়ানো চুলগুলো চকলেটের ডার্ক শেডের মতো, কাঁধের দুপাশে আলগা ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে আছে। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা গ্রেসফুল, আত্মবিশ্বাসের ছটা ঠিকরে বেরোচ্ছে। মাখনের মতো মসৃণ ত্বক, আঙুল ছোঁয়ালে পিছলে যাবে বোধ হয়।

দম বন্ধ করা সুন্দর সে নয়, তবে আবিষ্কার করলাম আমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সরাসরি কোনো মেয়ের দিকে তাকানো যায় না। ভদ্রতায় বাধে। কিন্তু একবার দেখার পর দ্বিতীয়বার ওই চোখে না তাকানোও অপরাধ। আড়চোখে দেখলাম।

সম্ভবত বড় ধরনের কোনো পুণ্য করেছিলাম গত কয়েক দিনে। আল্লাহ আমার প্রতি কিছুটা সদয় হলেন। দুগ্লাস চা নিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়াল স্বর্ণা। ডান হাতের গ্লাসটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল।

স্বর্ণা আমার এক্স কলিগ, বয়সে কয়েক বছরের ছোটই হবে আমার চেয়ে। আগের অফিসে 'আর্ট অ্যান্ড কালচার' পাতাটা দেখত। দুজনের একই সাথে চাকরি গেছে। কিন্তু ওকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে চাকরি যাওয়া কোনো ভয়াবহ ব্যাপার। চেহারা আরও খোলতাই হয়েছে, দুচোখে ফুর্তি। মাথাটা ডানে ঘোরাতেই আমাকে দেখতে পেল।

'কী অবস্থা ভাই?' স্বর্ণা বলল, 'এই দিকে হঠাৎ!'

'অবস্থা ঠিকঠাক,' হেসে বললাম আমি, 'আসলাম ঘুরতে ঘুরতে। তোমার বাসা কাছেই নাকি?'

'হুম, পেছনের গলিতে। ডি ব্লকে। কোথাও জয়েন-টয়েন করছেন?'

'না। তুমি?'

‘আরে ধুর, আমাকে কে চাকরি দেবে? এত ইজি নাকি?’

বোকার মতো হাসলাম। ঝোড়ো বাতাস থেমে গেছে ততক্ষণে। কিন্তু বৃষ্টির বেগ বেড়েছে আরও। খানিক দূরেই পলিথিনে ঢাকা শেলফের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। খুবই রিদমিক। মনে হচ্ছে, কেউ মৃদুস্বরে ড্রাম পেটাচ্ছে।

স্বর্ণা বলল, ‘কেমন বৃষ্টি শুরু হইল, না? চিপায় পড়ে গেলাম মনে হচ্ছে। চা খাবেন ভাই, নিয়ে আসি?’

‘না। তোমরা খাও,’ বললাম আমি, ‘মাত্রই খেলাম।’

হঠাৎ মনে পড়েছে এমনভাবে স্বর্ণা বলল, ‘পরিচয় করায়ে দিই। এইটা হইল আফরিন, আমার ফ্রেন্ড। আর আফরিন, উনি হইলেন তকী ভাই। চিনছিস তো?’

কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। চিনছিস তো—এ কথার মানে কী? এ রকম সুন্দর একটা মেয়ে তকী ভাইকে কেন চিনতে যাবে? কী ঠেকা পড়েছে তার! সমস্যাটা কী? ও যদি আমাকে চেনে, তো আমি কেন ওকে চিনতে পারছি না? এত সুন্দর একটা মেয়ের সাথে পরিচয় হলে কোনো কারণে ভুলে যাব, এমন হোপলেসও তো আমি না!

আফরিন আমার দিকে তাকাল। চোখ দুটো কনফিউজিং। আমাকে চিনতে পেরেছে মনে হলো না। অবশ্য সেটাই হওয়ার কথা। স্বর্ণা বলল, ‘আফরিন, তুই মনে হয় ভাইকে গুলায়ে ফেলছিস। আরে উনি তকী জোবায়ের। গত বইমেলায় ওনার একটা উপন্যাস তোকে কিনে দিছিলাম, ভুলে গেলি?’

‘রাইটার তকী জোবায়ের?’ আফরিন বলল।

‘হুম।’

মেয়েটার চোখ দুটো এবার সামান্য হাসল। আন্তরিক কিছু নয়, আবার প্লাস্টিক হাসিও না। সৌজন্যবোধের হাসি—একজন

মানুষের সাথে পরিচয় হওয়ার পর ঠিক যতটুকু না হাসলে নয়, মেপে মেপে ঠিক ততটুকু।

নীরবে হাসিটা ফিরিয়ে দিলাম। খানিকটা উৎকণ্ঠা হলো। অনেকগুলো ব্যাপার এখানে ঘটতে পারে। মেয়েটা হয়তো উপন্যাসটা পড়েইনি। সেই সম্ভাবনাই বেশি। গিফট পেয়েছে, এরপর শেলফে সাজিয়ে রেখেছে। বেশির ভাগ লোক এই কাজই করে। এটা অবশ্য এক দিক দিয়ে ভালো। এমন কোনো আহামরি বই লিখিনি যা পড়ে এই মেয়ে মুগ্ধ হয়ে যাবে। বিরক্তই হওয়ার কথা। এর চেয়ে না পড়াই বেটার।

আচ্ছা, ধরা যাক ... ও পড়েছে। সে ক্ষেত্রে এমন কি হতে পারে, ওর ভালো লেগেছে? এক পারসেন্ট চান্সও কি আছে? ভালো লাগলে হয়তো আমাদের কথা এগোবে। না লাগলে এখন এই মুহূর্তেই আমাকে বাতিল করে দেবে। কয়েন টসের মতো অবস্থা। হেড পড়লে পাস, টেল পড়লে ফেল।

কিছু একটা বলতে হয় বলেই বললাম, 'আফরিন, আপনি কি জব করেন? নাকি অন্য কিছু?'

উত্তরটা দিল স্বর্ণা।

'ভাই,' সে বলল, 'ও অন্ট্রাপ্রেনার। একটা অনলাইন পেজ আছে, অরনামেন্ট বিক্রি করে। মারমার কাটকাট সেল।'

'বাহ,' আমি বললাম।

ভালো করে দেখলাম ওকে এবার। অরনামেন্ট বিক্রি করে, অথচ নিজে কোনো গয়নাগাটি পরেনি। সাজগোজের মধ্যে শুধু কপালে একটা টিপ। ছোট্ট করে আঁকা। অদ্ভুত টিপটা। প্রথমে মনে হচ্ছিল কপালের মধ্যে একটা সবুজ সাপ ফণা তুলে আছে। পরে খেয়াল করলাম, ওটা আসলে সাপ না। চাঁদ—অর্ধেকটা মতো, বাঁকা হয়ে উঠেছে। হাতে ঘড়ি নেই, একটা কাপড়ের মতো জিনিস বাঁধা।

দেখতে চুলের ব্যান্ডের মতো। কী বলে এটাকে? ব্রেসলেট! বোকার মতো জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার হাতের এই জিনিসটার নাম কী?'

'স্ক্রাঞ্চি,' আফরিন মৃদুস্বরে বলল।

এরপর আবার কোনো কথা নেই। বুঝতে পারছিলাম না কী দিয়ে কথা শুরু করব। হঠাৎই ও বলল, 'আপনার উপন্যাসে দুটো ব্যাপার আমার ভালো লাগছে।'

আমি আগ্রহ নিয়ে তাকালাম।

'ওখানে একটা সিন ছিল সিগারেট খাওয়ার। একটা ছেলে রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছে, তার সিগারেট শেষ। কেনার টাকাও নাই। ওই সিনটা পড়ে আমার খুব সিগারেট টানতে ইচ্ছা করতেছিল।'

গল্প-উপন্যাস লিখে নানা ধরনের পাঠপ্রতিক্রিয়া পেয়েছি। এই টাইপের রিঅ্যাকশন কখনো পাইনি। একটু নড়েচড়ে উঠলাম। পকেট থেকে হাত দুটো বের করে বললাম, 'দ্বিতীয় ভালো লাগার ব্যাপারটা কী?'

'ওই বইয়ের একেবারে শেষে একটা চিঠি আছে। পড়ার পর মনে হইছে, ইশ্, আমাকে যদি কেউ ওরকম একটা চিঠি লিখত!'

বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমার চেহারার মধ্যে বোকা বোকা একটা ভাব ক্রমশ দৃশ্যমান হচ্ছে। আমাকে ভড়কে দিতে পেরে সে বেশ মজা পেয়েছে। হাসি চেপে রাখতে পারছে না। গভীরভাবে ওর চোখে তাকালাম। চোখ দুটোও হাসছে। অদ্ভুত ব্যাপার, সেখানে একটা গোপন দুঃখের ছায়াও যেন দেখতে পাচ্ছি। অ্যান্টি-রিফ্লেকটিভ চশমায় কাচের নিচে যেমন নীলচে আলোর ছটা পড়ে, তেমন করে ওর চোখের নিচেও আমি নীল রংয়ের চাপা দুঃখ দেখতে পেলাম। কেন দেখলাম, জানি না।

সম্ভাব্য একটা ব্যাখ্যা এমন হতে পারে যে আমি চাই ওর মনে

একটা গোপন দুঃখ থাকুক। তাহলে সেই দুঃখ দূর করতে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব। ঝাঁপানোর একটা সুযোগ আমার খুব দরকার।

বৃষ্টির ছাট গায়ে এসে লাগছে। শার্টের বাঁ দিকটা ভিজে চুপচুপা। কিন্তু আমি কিছু টের পাচ্ছিলাম না। একটা অনুভূতি ক্রমশ আমাকে গ্রাস করছিল, যা এই ঝড়-বৃষ্টির চেয়েও তীব্র, এমনকি আমার নিজের অস্তিত্বের চেয়েও।

একটা সুন্দর মেয়ে পাত্তা দিচ্ছে বোঝার পর সম্পর্কটাকে আর এক ধাপ সামনে না নেওয়া অপরাধ। স্মার্ট লোকরা অনায়াসে কাজটা করে থাকে। সমস্যা হলো, আনস্মার্ট হিসেবে আমার বেশ নামডাক আছে।

তবে সেপ্টেম্বরের ওই ঝোড়ো বিকালে কী হয়েছিল জানি না। নির্লজ্জের মতো বলে বসলাম, 'আমরা কি ফেসবুকে কানেকটেড হতে পারি?'

***

পৃথিবীতে কিছু লোক আছে, যাদের মূল কাজ আফসোস করা। এটা পেলাম না, ওটা হলো না—এগুলোর একটা লম্বা লিস্ট হাতে তারা বসে থাকে। আমি কিন্তু অল্পতেই খুশি থাকতে জানি। পেট ভরে ভাত খাওয়ার বাইরে আমার চাহিদা খুব সামান্য।

মাসে গোটা পাঁচেক ভালো বই পড়তে চাই। দু-তিনটা সিনেমা দেখতে পারলে চমৎকার, না পারলেও চলবে। এখন আর সিগারেট খাই না। সুতরাং সে চাহিদা নেই। তবে যেদিন খুব বৃষ্টি নামে সেদিন একটু হুইস্কি খেতে ইচ্ছে করে। তবে সেটা না হলেও যে জীবন থেমে থাকবে, তা নয়। নারীসংক্রান্ত চাহিদা নেই। মাস্টারবেট করেই দিব্যি চলে যাচ্ছে।

তবে আফরিনের সাথে ফেসবুকে কানেকটেড হওয়ার পর

থেকেই টের পাচ্ছিলাম, কোথাও একটা একটা চাহিদা তৈরি হচ্ছে। রাত ১২টা নাগাদ আর না পেরে ওর প্রোফাইলটা স্টক করতে শুরু করলাম। ১২টা বেজে আট মিনিটে স্টকিং শেষ। কারণ, ওর আইডিতে দেখার মতো কিছু নেই। সব মিলিয়ে গোটা তিরিশেক ফ্রেন্ড। কোনো ছবি নেই, বায়ো নেই, পোস্ট নেই। একেবারে নিরামিষ প্রোফাইল। আগে থেকে না জানলে ফেক বলে মনে হবে।

'হ্যালো, কী করেন?' লিখেই লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে হলো। স্বল্প পরিচিত কোনো মেয়েকে মেসেজ দেওয়ার জন্য মাঝরাত মোটেই ভদ্র সময় নয়। একবার ভাবলাম, মেসেজ ডিলিট করে দিই। পরে মনে হলো, সেটা আরও খারাপ হবে। বাথরুমে গেলাম। ফিরে এসে দেখি রিপ্লাই এসেছে।

'বই পড়তেছি,' আফরিন লিখেছে।

'কী বই?'

'আছে একটা। আপনার ভালো লাগবে না।'

'কীভাবে জানেন, ভালো লাগবে না?'

'একটা থ্রিলার। সিডনি শেলডনের। পড়েন এগুলো?'

'না।'

'জানি তো, পড়েন না। আপনি কী করেন?'

'একটা লেখার ট্রাই করতেছিলাম।'

'কী লেখা?'

'নোয়াম চমস্কির একটা ইন্টারভিউ। অনুবাদ করতেছি। খুবই বোরিং জিনিস।'

'বোরিং জিনিস কেন অনুবাদ করতেছেন?'

'টাকা পাওয়া যাবে', লিখে একটা স্মাইলি দিলাম, 'একটা প্রশ্ন করি। রাগ করবেন না তো?'

'করতেও পারি। গ্যারান্টি দিতে পারতেছি না।'